ছায়াছবি

(গল্পগ্রন্থ – ছায়াছবি)

এক বন্ধুর মুখে এ গল্প শোনা।

আমার বন্ধুটি অনেক দেশ বেড়িয়েচেন, লোক হিসেবে অমায়িক, রসিক ও শিক্ষিত। কলকাতাতেই থাকেন।

যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন গল্পে গল্পে অনেক সময় সারারাত কেটে যায়।

প্রকৃতপক্ষে ঠিক মনের মতো লোক পাওয়া বড় দুষ্কর। অনেক কষ্টে একজন হয়তো মেলে। অধিকাংশ লোকের সঙ্গে যে আমাদের আলাপ হয়, সে সম্পূর্ণ মৌখিক। তাদের সঙ্গে আমাদের হয়তো ব্যক্তিগত অভ্যাসে, চরিত্রে, মতে, ধর্মবিশ্বাসে, বিদ্যায় যথেষ্ট তফাত। কিন্তু একই আফিস কি কলেজে কি কোর্টে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, দু-বেলা দেখা হয়—দাদা কিংবা মামা বলে সম্বোধন করতে হয়, কৌটাস্থ পানের খিলির বিনিময়ও হয়তো হয়ে থাকে—কিন্তু ওই পর্যন্ত। মন সায় দিয়ে বলে না তার সঙ্গে দু-বেলা দেখা হলে গল্প করে বাঁচি। কোনো নিরালা বাদলার দিনে আফিসের হরিপদ-দার সঙ্গ খুব কাম্য বলে মনে হবে না।

আমার বন্ধুর নাম—থাক গে, নামের দরকারই বা কি ?আবার লোকে তাঁকে বিরক্ত করবে। কৌতূহলী লাকের সংখ্যা সর্বত্রই বেশি। কোনো কাজ নেই—গিয়ে আনন্দ করবে আর বকবক বকাবে। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী। হাতে পয়সা এবং কলকাতায় বাড়ি আছে। বাড়ির গ্যারেজে মোটর গাড়ি থাকবার অন্য কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু আমার বন্ধু আড়ম্বর ও বিলাসিতা পছন্দ করেন না।

ভূমিকা এই পর্যন্ত।

সেদিন খুব বর্ষার দিন। একা বাড়ি বসে বসে ভালো লাগল না। একখানা ট্রেন ধরে কলকাতায় পৌঁছুলাম। ভীষণ বর্ষায় ট্রাম বন্ধ। বাস ক্কচিৎ দু-একখানা চলচে। জল ভেঙে হেঁটে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছুলাম।

—বন্ধু আমায় দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন বলাই বাহুল্য। তখনই গরম চা ও খাবারের ব্যবস্থা হল। পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার ভদ্রতা বাদ গেল না। তাঁর বৈঠকখানার গদি-আঁটা আরাম-কেদারায় ততক্ষণ বেশ হাত-পা এলিয়ে বসে পড়েছি।

সন্ধ্যার পরে আবার সজোরে বৃষ্টি নামল। বেশি ঠাণ্ডাবোধ হওয়াতে পাখা বন্ধ করতে হল।

বন্ধুর আতিথেয়তা আমার সুপরিচিত। তিনি বললেন—ঘরে স্টোভ আছে, চলুন দোতলার ঘরে। এই বৃষ্টিতে কেউ আসবে না। খিচুড়ি চড়িয়ে দিই। ডিম আছে, আলু আছে—

—চমৎকার !

—মাছ দেখতে পাঠাব রঘুয়াকে ?

—কোনো দরকার নেই। আমাদের ওতেই হয়ে যাবে।

—চলুন ওপরের ঘরে। রাতে এখানে খাবেন এবং থাকবেন।

—নইলে আর যাচ্ছি কোথায় ?

—যেতে চাইলেও যেতে দেওয়া হবে না।

ওপরের বসবার ঘরটিতে বন্ধুর লাইব্রেরি। দেওয়ালের গায়ে সারি দেওয়া কাচের আলমারি, সাধারণত বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বইয়ে ভর্তি। দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং—প্রতিকৃতি বই—সবই ল্যান্ডস্কেপ। ভালো চিত্রকরের হিমালয় অঞ্চলের দৃশ্য। আমার বন্ধু হিমালয়কে অত্যন্তভালোবাসেন। হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে। অনেকদিন রাত্রে হিমালয়ভ্রমণের নানা মনোরম গল্পে রাত্রি কখন কেটে গিয়েচে, টেরও পাইনি।

ওপরের ঘরে যখন গিয়ে বসলুম, তখন টেবিলের ওপর একখানা ছবিওয়ালা বই খোলা পড়ে আছে। বন্ধু হাতে নিয়ে বললেন—এখানা দেখেচেন ?হিমালয়ান জার্নাল। সোয়েন হেদিনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেরিয়েচে।

—কোথাকার ?

—কাশ্মীর।

—এমন শৌখিন স্থানে সোয়েন হেদিন বেড়াতেন বলে তো জানতাম না। কোথায় তাক্‌লা মাকান, কোথায় কারাকোরাম—এ সব দূর দুর্গম স্থান ছাড়া তিনি—

—না, চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা করেচেন এ লেখাটায়, দেখবেন।

দেখবার চোখ ছিল ভদ্রলোকের—যা সকলের থাকে না।

—একশো বার সত্যি।

তারপর আমাদের গল্প আরম্ভ হল প্রধানত কাশ্মীর নিয়েই। কাশ্মীর আমার বন্ধুটির জীবনের একটি তীর্থক্ষেত্র—অনেকবার তিনি ক্লান্ত নাগরিকের মন ও চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বেরুতেন আমি জানি। কাশ্মীরেও গিয়েছেন অনেকবার। কাশ্মীরের কথায় সাধারণত তিনি পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন। এবার কিন্তু একটা নতুন বিষয় নিয়ে তিনি কথা পাড়লেন।সেটা হল তাঁর একটি অতি প্রাকৃত অভিজ্ঞতা, যেটা কাশ্মীরের পথেই ঘটেছিল।

বন্ধু বললেন :

সেবার পুজোর পরে আমার বাল্যসুহৃদ রতিকান্ত মৈত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে তারই মোটরে দু-জনে কাশ্মীর যাত্রা করা গেল। রতিকান্ত প্রতিবৎসর নিজের মোটর নিয়ে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে কোথাও না কোথাও যাবে। এবার আমারই কথায় সে কাশ্মীর রওনা হল। পথের আনন্দ ও কষ্ট ভোগ করতে করতে আমরা দিল্লি গিয়ে পৌঁছুলাম। সেখানে দিন দুই বিশ্রাম করে আমরা আবার মোটর ছাড়লুম।

বাকি পথটুকু বেশ কাটল। সে বর্ণনা বিস্তৃতভাবে করবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

কোহালায় পৌঁছুলাম দিল্লি থেকে রওনা হবার তিন দিন পরে সন্ধ্যার দিকে। মোটর থামিয়ে কোহালার বাজারে একটি চায়ের দোকানে চা-পান করতে বসলাম দু-জনে। গাড়িতে রইল ক্লিনার রামদীন ও ভৃত্য নাথু বাগ। শেষোক্ত ব্যক্তির নামটি অবাঙালির মতো শোনালেও প্রকৃতপক্ষে ওর বাড়ি মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় এবং সে বাঙলা ছাড়া অন্য প্রদেশের ভাষা জানে না।

চা-পানের সময় দোকানদারকে আমাদের রাত্রির জন্যে একটু বিশ্রামস্থানের সন্ধান দিতে বললাম। সে দু-একটা সন্ধান দিলে। বড় পরিশ্রান্ত ছিলাম সেদিনটা। রাত্রিটাতে একটু ভালো ঘুমের দরকার। নাথুকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে (কারণ তার দ্বারা এ বিষয়ে কোনো সাহায্যই পাওয়া সম্ভব নয়) রামদীন ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বাসার সন্ধানে বার হই।

রতিকান্ত বললে—গাড়ির একটা আস্তানাও তো খুঁজতে হবে ?

আমি বললাম—খুঁজে পেলে ভালো হয়। বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা। নাথু তো শীতে জমে যাবে গাড়িতে থাকলে বাইরে।

—রামদীন বরং পারে।

রামদীন বললে—হামারা ওয়াস্তে কোই পরোয়া নেহি হুজুর—

কিন্তু বাসা কোথাও পাওয়া গেল না। কোহালা বড় জায়গা নয়। বাজারের সরাইগুলো পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভিড়ে পরিপূর্ণ। একখানা দোকানের পেছনদিকে একটা ঘর আছে বটেদোকানদার দেখালে।—কিন্তু সে ঘর এত অপরিষ্কার ও আলোবাতাসহীন যে, সে ঘরে রাত্রি কাটানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া সে ঘরে বিশ্রাম

করতে গেলে মোটর বাইরে পড়ে থাকে। রামদীন মুখে বলেছে বলেই তাকে হিমবর্ষী রাত্রে বাইরে শুইয়ে রাখা যায় না।

রতিকান্ত বললে—উপায় ?

আমি এর আর কি উপায় বলব !

পরামর্শ করা গেল সেই চায়ের দোকানীর কাছে আবার যেতে হবে। তাকে গিয়ে এমনভাবে ধরা হল যেন এই পার্বত্য দেশে সে-ই আমাদের একমাত্র রক্ষক ও অভিভাবক। তারই মুখ চেয়ে আমরা বাড়ি থেকে এই দু-হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে এসেচি।

দোকানদার লোক ভালো। সে বলে দিলে বাজারের পেছন দিয়ে যে পথটা ছোট্ট পাহাড়টা ডিঙিয়ে চলে গেল, ওরই ওপারে এক বৃদ্ধ জাঠের বাড়ি। সে বাড়িতে অনেক সময় লোকজনদের আশ্রয় দেয়।

আমরা দুজনে দোকানদারের কথামতো সেখানে গেলাম।

বাড়িখানা কাঠের দোতলা। দেখে মনে হয়, এক সময়ে বাড়ির মালিকের অবস্থা ভালোই ছিল।

আমাদের ডাকাডাকিতে একজন বৃদ্ধ দাড়িওয়ালা লম্বা সুপুরুষ ব্যক্তি দোর খুলে রুক্ষস্বরে জিগ্যেস করলে—কিস লিয়ে হল্লা মচাতে হো ?কৌন হ্যায় তুম লোক ?

আমরা বিনীতভাবে আমাদের আসবার কারণ ব্যক্ত করলাম। আমরা নিরীহ পথিক, কোনো গোলমাল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বৃদ্ধ বললে—কোথা থেকে আসচ তোমরা ?

অবশ্য হিন্দিতেই বলেছিল কথা।

আমরা বললাম—কলকাতা থেকে।

—ঘরভাড়া আমি দিই না।

—মেহেরবানি করে একটু জায়গা দিতেই হবে।

—কে বললে এখানে জায়গা আছে ?

—বাজারে শুনলাম।

—আমি ঘরভাড়া দিই না।

—ভাড়া না দেন, একটু আশ্রয় দিন।

বৃদ্ধ একটুখানি কি ভেবে বললে—ক-জন লোক ?

—চারজন। তবে একজন মোটরে শুয়ে থাকবে বাজারে।

—একখানা ঘরের বেশি দিতে পারব না।

—তাই আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করব।

আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম লোকটি আমাদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক আছে বলে আমাদের মনে হল না। সিঁড়ির বাম দিকের কোণের ঘরে সে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললে—এই ঘরটা আমি দিতে পারি। আর ঘর নেই। কারপেটখানা পেতে নেবেন। বাইরের টবে জল আছে। গরমজল দিতে পারব না—কিন্তু—বলেই লোকটা চুপ করে গেল।

আমাদের ভয় হল পাছে সে আবার মত বদলায়। আমরা উভয়েই জোর করে বললাম—আপনার খুব মেহেরবানি। চমৎকার ঘরটি।

—জিনিসপত্র কোথায় ?

—মোটরেই আছে। আরো দু-জন লোক মোটরে আছে। তাদের একজনকে নিয়ে আসি।

—কি খাবেন রাত্রে ?এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে না।

—কোনো দরকার নেই। আমরা দোকান থেকে আনিয়ে নেব। চলুন, আমরাও নিচে যাই। বাজারে যাব।

আধ ঘণ্টা পরে আমরা আবার এসে ঘরে বিছানাপত্র পেতে নিলাম। রামদীন মোটরেই রইল। রতিকান্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। তারই অনুরোধে আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম, তারপর আমি নিজে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

বাজারের রাস্তা সামনের ছোট পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যে উপত্যকায় নেমেছে, তারই এপারে এই ছোট্ট দোতলা কাঠের বাড়িটি। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেচে, সামনের নিম্নভূমি অর্থাৎ উপত্যকায় বেঁটে ওক, চেনার ও সরল গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব শোভা। বাতাস বেশ শীতল। আমার যেন চোখে ঘুম আসচে না, এই সুন্দর বনাবৃত উপত্যকার শান্ত কুটিরখানি সারারাত্রি জেগে ভোগ করি এই যেন আমার মনের গূঢ় বাণী। কিন্তু শরীর মানল না। পথক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়তে চাইছিল শয্যায়। অগত্যা শয্যা আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি জেগে উঠে বিছানার ওপরে বসলাম। কি একটা শব্দ যেন আমি ঘুমের ঘোরে শুনেছি, তাতেই ঘুম ভেঙেচে। শব্দটা তখনো হচ্চে, আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়ল নিম্নের উপত্যকার বনভূমির দিকে। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়ল যাতে আমি পাথরের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। চাঁদ হেলে পড়েচে পশ্চিম আকাশে, তারই সুস্পষ্ট আলোতে দেখি একটি নারীমূর্তি আমার সামনের কি একটা বড় গাছের ডালে দোল্না বেঁধে দোল খাচ্ছে।

ভালো করে চেয়ে দেখলাম। হ্যাঁ নারীই বটে, সুন্দরী নারী। বাইশ-তেইশের মধ্যে বয়স।

কিন্তু মেয়েটির দোল খাওয়ার স্থান—বিশেষ করে সময়, আমার কাছে বড় আশ্চর্য বলে মনে হল। কাশ্মীরের দিকে কখনো আসিনি। এখানকার মেয়েরা এই হিমবর্ষী রাত্রের শেষ প্রহরে বনে এমনভাবে দোলনা টাঙিয়ে দোল খায় নাকি ?...

দৃশ্যটা যদি শুধু সুন্দর হত—সুন্দর সন্দেহ নেই—তাহলে আমি এমন অস্বস্তি বোধ করব কেন ?আমার যেন মনে হল এই দৃশ্যের মধ্যে একটি জিনিস আছে—যা অশিব, যা নিয়মের বিপরীত, যা অমানুষী !

তাড়াতাড়ি রতিকান্তকে ডাকলুম। সেও যখন বাইরে এল, তখনো মেয়েটি দোল খাচ্ছে।

রতিকান্তকে বললাম—ও কে ভাই ?

সে অবাক হয়ে গিয়েছে। চোখ রগড়ে বললে—তাই তো !

—এখানকার মেয়েরা ওরকম করে নাকি ?

—তা কি জানি ?

হঠাৎ রতিকান্ত বলে উঠলো—ওকি ! দোলনায় দড়ি কই ?গাছে টাঙিয়েচে কি দিয়ে ?ভালো করে চেয়ে দেখলাম, সত্যই তো, দোলনার দড়ি অস্পষ্ট এত যে চন্দ্রালোকে দেখা যাচ্ছে না। সরু তার হলেও দেখা যাবে এ আলোতে। কিন্তু তার বা দড়ি কিছু নেই—শূন্যে ঝুলচে দোলনা। আরো একটা ব্যাপার যা এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম—আমাদের থেকে অল্প দূরেই গাছটার তলায় এ ব্যাপার ঘটচে, অথচ কোনোরকম শব্দ আমাদের কানে আসচে না। সবসুদ্ধ মিলিয়ে যেন একটা ছবি।

রতিকান্ত বললে—ভাই, বাড়িওয়ালাকে ডাকব ?

—ডাকো।

—আবার এরই কেউ না হয়—তাহলে হয়তো চটে যাবে !

—তুমি ডাকো। যা হয় হবে।

কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিলাম দু-জনে বোধ হয় কয়েক সেকেন্ড। পরক্ষণেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি কোথায় সেই দোদুল্যমানা তরুণী নারীমূর্তি। কিছুই নেই সে গাছের তলায় ! ওই তো সেই বাঁকা ডালটা, জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেচে গাছটার শুভ্র কাণ্ড; পাশের বেঁটে ওক গাছটা তেমনি দেখা যাচ্চে—কিন্তু কেউ কোথাও নেই, গাছের তলা একদম ফাঁকা।

রতিকান্ত বললে—ওকি, কোথায় গেল ?

—তাই তো।

—আশেপাশে নেই তো ?

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কেউ পালাতে পারে না—আমাদের দুজনের চোখ এড়িয়ে এই জ্যোৎস্নালোকিত উপত্যকা থেকে। যাবার আর কোনো রাস্তা নেই, বাজারে যাবার ওই সঙ্গে পায়ে চলার পথ ছাড়া। পেছনে উঁচু পাহাড়টা। বনের নীচে আগাছার জঙ্গল নেই বাংলাদেশের মতো—বেশ পরিষ্কার তলা দেখা যাচ্চে জ্যোৎস্নায়। সম্ভব নয়, কোথাও লুকানো বা পালানো আমাদের চোখ এড়িয়ে—এত অল্প সময়ের মধ্যে।

রতিকান্ত বললে—ব্যাপার কি ?

—তাই তো আমিও ভাবচি !

—এ দেখচি একেবারে ম্যাজিক—

—সেই রকমই মনে হচ্চে।

—কি করা যাবে এখন ?

—শোয়া ও ঘুমুনো।

রাত বড় বেশি ছিল না। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে রতিকান্ত ও আমি দেখি নাথুর তখনো নাক ডাকচে। ওকে উঠিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলে আমরা আবার এসে বারান্দায় দাঁড়ালুম। ওই সেই গাছটা, ওই সেই বাঁকা ডালটা। সত্যি সত্যি কাল শেষরাতের দিকে আমরা দুজনে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখেচি ! কিন্তু আমাদের নিজেদের কাছেই মনে হচ্চে ওটা আসলে ঘটেনি, হয়তো রাত্রির স্বপ্ন।

স্বপ্ন ?কি জানি ?

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা মোটরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দোকানী বন্ধু চেরা সরল কাঠের ডাল উনুনে দিয়ে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করচে। আমাদের দেখে বললে—কি, জব্বর ঘুম হয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি তো ?

আমি যেন দোকানীর কথার সুরে ও দৃষ্টিতে একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন লক্ষ্য করলুম।

আমরা চা দিতে বলে ওর দোকানের সামনে জাঁকিয়ে বসে রাতের ঘটনা সবিস্তারে ওকে বর্ণনা করলাম।

দোকানী ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—জানি বাবুজি। এই জন্যেই ও বাড়ির সন্ধান আপনাদের দিতে ইতস্তত করছিলাম। ওই বনে জ্যোৎস্নারাতে কত লোক ও মেয়েটিকে দুলতে দেখেচে। ও মানুষ নয়—জিন, আফ্‌রিট, হুরি—

বলে হাত নেড়ে যেন সব জিনিসটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আপনারা আজই কোহালা ছেড়ে চলে যান। আমি জানি যারা ওই খুবসুরত জিন হুরির মোহে পড়ে ওই কাঠের ঘরভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন থেকে গিয়েচে—শেষকালে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। একবার একটা আত্মহত্যাও ঘটেছিল। বেশিদিন থাকলেই বিপদে পড়ে যাবেন। বাড়িওয়ালা বুড়ো এই জন্যেই আজকাল বাড়িভাড়া দিতে চান না।

আমরা বললাম—তোমরা তো স্থানীয় লোক, তোমরা দেখতে পাও ?

—রোজ কি জিন, আফরিটদের নজরে পড়ে ?দু-মাস হয়তো কিছুই না, একদিন হয়ে গেল। কানুন কিছু নেই। তবে কানুনের মধ্যে এই, চাঁদনী রাত হওয়া চাই রাতের শেষপ্রহর হওয়া চাই। এখানকার লোকেরা সাঁঝ জ্বালার পর ও-পথে বড় একটা যাতায়াত করে না।...

—হ্যাঁ, একরুপেয়া সাড়ে সাত আনা হুজুর। আদাব হুজুর।